একক ১ ❐ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ প্রাচীন যুগ

১.৪ মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব

১.৫ আধুনিক পর্ব

১.৫.১ ঊনবিংশ শতক

১.৫.২ বিংশ শতাব্দী

১.৫.৩ আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা

১.৫.৪ নোয়াম চমস্কি

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠ করলে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন কালে গ্রিস ও ভারতের মতো প্রাচীন দেশগুলোতে ভাষা সম্পর্কে কী ধারণা ছিল সে সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা।
- এই এককে প্রাচীন যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ভারত ও পাশ্চাত্ত দেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।
- এই এককের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা কীভাবে আধুনিক পর্বে প্রবেশ করল তা জানানো।
- এই এককের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক পর্বে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি ও প্রকরণে যত বৈচিত্র্য ঘটেছে তার পরিচয় দেওয়া।

১.২ প্রস্তাবনা

- শিক্ষার ভাষাবিজ্ঞান একালে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এই বিদ্যার চর্চা নিতান্ত আধুনিক নয় এর একটা ধারাবাহিক ও প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এই এককে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক দিক পরিবর্তন ঘটে। এই এককে এই দিক্ পরিবর্তনের আগেকার অবস্থাটা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে আমরা কয়েকটি যুগে ভাগ করতে পারি—(১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব (৩) আধুনিক যুগ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী।

ভাষাবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে মানুষের ভাষার অথবা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ভাষাগুলির সাধারণ রীতি বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করে। যে পদ্ধতিতে এই অনুসন্ধান চলে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক। বলা যায় Linguistics is the scientific study of language। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই ভাষাবিজ্ঞান সদা প্রগতিশীল (prograssive) এবং সদা সক্রিয় (dynamic) একটি বিদ্যা (discipline) । ভাষাবিজ্ঞান-আলোচনার পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল ঃ—

১) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Comparative Linguistics) ঃ এখানে একাধিক ভাষার বৈশিষ্ট্য তুলনা করে দেখানো হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং বংশগত উৎসও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পথ ধরেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে।

২) ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics) ঃ এই পদ্ধতির দ্বারা কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ একটি ভাষার প্রাচীনতর সাহিত্য থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত লিখিত রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়। তাই একে কালানুক্রমিক আলোচনা বা diachronic study বলা হয়।

৩) বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics) ঃ এই পদ্ধতির দ্বারা কোনো একটি ভাষাসম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। তাই একে এককালিক আলোচনা বা Synchronic study বলা হয়। ব্যাপক অর্থে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বা Structural Linguistics বলা হয়। কারণ ভাষার এককালের গঠন (structure) বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তবে এখানে মনে করা হয়, ভাষার প্রত্যেকটি উপাদন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সবাইকে নিয়ে ভাষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ারূপে কাজ করে, একারণে তার কোনো উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। কোনো একটি উপাদানে পরিবর্তন হলে তা ভাষার শরীরের অন্য উপাদানকে প্রভাবিত করে। ভাষাকে এইভাবে একটি সামগ্রিক অবয়ব (structure) রূপে দেখা হয় বলে এই শাখাটির আর একটি নাম হল অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান বা macro-linguistics। এই শাখাটির অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভাষার অর্থের দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়।

১.৩ প্রাচীন যুগ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য দেশ গ্রিসে প্রাচীন যুগ থেকেই ভাষাবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। গ্রিসে এর সূচনা হয়েছিল প্লেতোর (Plato) ৪২৫-৩৪৮/৪৭ খ্রিঃ পূর্বাব্দে প্লেতো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ Dialogues-এর ক্রাতিলুস (Cratylus) নামক অধ্যায়ে ভাষার ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা আলোচনা করেছেন। আমরা ভাষায় কোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশের জন্য নানা ধ্বনিসমষ্টি বা বিভিন্ন নামশব্দ ব্যবহার করি। সেই সব ভাব বা বস্তুর সঙ্গে ওইসব ধ্বনির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কিনা—ভাষাবিজ্ঞানে এটি একটি বড়ো জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে দুটো বিরোধীপক্ষ গড়ে ওঠে। যাঁরা বলেন অর্থের সঙ্গে ধ্বনির, বস্তুর সঙ্গে তার নামের একটা অপরিহার্য সাদৃশ্য আছে। তাঁদের বলা হয় সাদৃশ্যবাদী (analogist) আর যাঁরা মনে করেন ভাব বা বস্তুর নাম আমরা ইচ্ছানুযায়ী দিয়ে থাকি, তাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের সম্পর্ক নেই তাঁদের বলা হয় যথেচ্ছাবাদী বা (anamolist)। এই 'কথোপকথনে' (Dialogum)ই প্লেতো বলেছেন—চিন্তা হল মানুষের নিজের সঙ্গে নীরব কথোপকথন। আর ধ্বনির সাহায্যে সেই চিন্তা থেকে যে প্রবাহটি আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাই ভাষা। তাই তাঁর মতে ভাষার সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে। প্লেতো গ্রিক ধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করেছেন। ধ্বনির তিনধরনের শ্রেণিবিভাগ তিনি করেছেন—স্বরধ্বনি, অর্ধস্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। তাঁর পথ অনুসরণ করেই পরবর্তী বৈয়াকরণেরা বাক্যে ব্যবহৃত পদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্লেতোর শিষ্য আরিস্তাতল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) ছিলেন পুরোপুরি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। তিনি ভাষার বহিরঙ্গ গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তার জন্য আলাদা কোনো গ্রন্থ তিনি রচনা করেননি। কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'Poetics' যার আসল নাম পেরিপোইএতিকেস্ অর্থাৎ On the art of Poetry. তার মাত্র তিনটি অধ্যায়ে তিনি ভাষা সম্পর্কে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ভাষাকে 1) Letter 2) Syllable 3) Conjucntion 4) Article 5) Noun 6) Verb 7) Case 8) Speech ইত্যাদি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে Letter বা বর্ণই হচ্চে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান। এই বর্ণ হচ্ছে অবিভাজ্য ধ্বনি। বর্ণ হয় তিনরকম স্বর (vowel) ব্যঞ্জণ (mute) এবং অর্ধস্বর (Semivowel) । তিনি বলেছেন—বাক্যই হচ্ছে ভাষার বৃহত্তম একক অর্থাৎ Sentence is the unit of language। এই বাক্যকে বিভাজন করা হয় কতকগুলি শব্দ বা পদে। শব্দ বা পদকে আবার বিভাজন করা যায় অক্ষরে। আরিস্তোতল বিশেষ্য পদের কথা বলেছেন কিন্তু বিশেষণ (adjective) বা সর্বনাম (pronoun) সম্পর্কে কিছু বলেননি।

প্লেতো বা আরিস্তোতল কেউই ভাষাতত্ত্বকে একটা আলাদা শাস্ত্র (independent discipline) হিসাবে দেখেননি। ভাষাতত্ত্বকে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হলেও এই আলাদা মর্যাদা যাঁরা দিলেন তাঁরা হলেন স্টোয়িক (Stoic) দর্শনগোষ্ঠীর লেখক। ৩০৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে এথেন্সে জেনো (Zeno) এই গোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন। Stoic গোষ্ঠীর লেখকরা 'case' বা কারক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন কারকের যেসব নাম তাঁরা দিয়েছেন লাতিনভাষার মধ্য দিয়ে এখন ইংরেজি ভাষায় সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। 'case' শব্দটি লাতিন (casus) থেকে ফরাসিভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়েছে। শব্দটি গ্রিক ভাষার 'ptosis' থেকে অনূদিত হয়েছে, যার মানে "fall"। Stoc রা মনে করেন সব "case" ই মূল nominative case থেকে অর্থাৎ "fallen away" পতিত হয়েছে। গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব-চর্চা সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছিল আলেকজান্দ্রীয় যুগে (Alexandrian Age literature) আনুমানিক ৩০০-১৫০খ্রিঃ পূর্বাব্দে। গ্রিক ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করেন দিত্তানিসিত্তণফ্রাক্স (Dionysion Thrax) খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণে তিনি গ্রিক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। থ্রাক্স প্রথমে গ্রিক বর্ণমালার ধ্বনিগুলির উচ্চারণগত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বা অঘোষ-সঘোষ এইভাবে যে ধ্বনির পার্থক্য ঘটতে পারে তা উল্লেখ করেছেন। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলিকে আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন তিনি।

লিঙ্গ, বচন, কারক সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, বচন ভাব (mood) তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেননি, যদিও বাক্যতত্ত্ব বোঝাতে syntax শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাক্যতত্ত্ব নিয়ে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন আপোলোনিওস দিসকোলাস্ (Apollonious Dysxolos) খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। থ্রাক্স এর ব্যাকরণকে অনুসরণ করে তিনি একাধিক ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু তার অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না।

গ্রিক ব্যাকরণের আদলে লেখা হল লাতিন ব্যাকরণ। গ্রিক সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল রোমানদের ওপর, যখন গ্রিসের উপরে রোমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল খ্রিঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে। প্রথম যে লাতিন ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর বৈয়াকরণ ভারো (Varro) রচিত 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা' (De Lingua Latina)। গ্রিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও ভারোর লেখায় কিছু মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। লাতিন ভাষার অবিভক্তিক শব্দগুলির তিনি রূপতত্ত্বগত শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যে সমস্ত পদের সঙ্গে কারক বিভক্তি (Case inflexion) যোগ করা হয় সেগুলি বিশেষ্যপদ (Nouns) ; যে সমস্ত পদের সঙ্গে কাল-বিভক্তি যোগ করা হয় সেগুলি হল ক্রিয়াপদ ও যে সমস্ত পদের সঙ্গে কারক ও কালবিভক্তি (tense inflexion) দুই যোগ করা হয় তাদের বলা হয় কৃদন্ত-বিশেষণ (participles) এবং যে সমস্ত পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তিই যোগ করা হয় না সেগুলি হল ক্রিয়াবিশেষণ (adverbs)। পরবর্তী লেখক কুইন্তিলিয়ান (Quintilian) (খ্রিঃ প্রথম শতাব্দী) তাঁর 'ইন্স্তিতুতি ওরাতোরিও' (Institutuo Oratoria) গ্রন্থে ব্যাকরণ বিষয়ে অল্পই আলোচনা করেছেন। প্রধানত অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর লেখায় গ্রিক বৈয়াকরণদের প্রভাব অনেক বেশি। লাতিন ভাষায় লেখা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হচ্ছে দোনাতুস (Donatus) এর লাতিন ব্যাকরণ (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) আর্স মাইনর (Ars Minor)। বইটি আর এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, কাঠের টাইপে ছাপা এটি প্রথম বই। গ্রিক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ান-এর 'ইন্স্তিতুতিওনেস্ গ্রামাতিকা' (Institutiones Grammaticae) নামক রচনায় (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। যদিও তিনি মূলত গ্রিক বৈয়াকরণ থ্রাক্স এবং আপোলোনিওসকেই অনুসরণ করেছেন তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। যেমন, বাক্যতত্ত্ব বা Syntax-এর আলোচনা প্রিস্কিয়ান-এর নিজস্ব মৌলিক সংযোজন। পদবিভাগের ক্ষেত্রে থ্রাক্স Interjection এর উল্লেখ করেননি, কিন্তু প্রিস্কিয়ান করেছেন। আবার, থ্রাক্স পদের মধ্যে article কে ধরেছেন, প্রিস্কিয়ান বাদ দিয়েছেন। শুধু রোমে নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত লেখা সমস্ত ব্যাকরণই প্রিস্কিয়ানকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা দেখা যায় বৈদিক যুগেই আনুমানিক (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ-৬০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)। বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলিতে ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটা মূল ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলিতে বৈদিক সংহিতার কোনো কোনো সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। বিশেষ করে ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধির বিধান, পদবিভাগ, বিভক্তি, বচন এবং ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আছে। সেই হিসাবে প্রাচীন ভারতে ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ এখানে ঘটে বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়, 'বেদাঙ্গে'র মধ্যে। বেদাঙ্গগুলি ছিল বেদপাঠের সহায়ক গ্রন্থ। বেদাঙ্গ ছটি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। কল্প ও জ্যোতিষ বাদে বাকি চারটি 'অঙ্গে' ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা রয়েছে। যেমন, ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে 'শিক্ষা'য়। আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) বলি বৈদিকযুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই বোঝাত। এই 'শিক্ষা'র পরিপূরকরূপে কিছু গ্রন্থ রচিত হয় তাদের বলা হত 'প্রাতিশাখ্য'। বিভিন্ন বেদের ভিন্ন প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। 'নিরুক্ত' গ্রন্থে আছে শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের প্রয়াস। বৈদিক ভাষার অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দের একটি তালিকা করা হয়েছিল—তার নাম 'নিঘন্টু'। কিন্তু এই

তালিকার রচয়িতার নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে বুৎপত্তি নির্ণয়ের সার্থক নির্দশন পাওয়া যায় যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর মধ্যে। এই 'নিরুক্ত'-এ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে ও অর্থ প্রতিপন্ন করতে বেদ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। বেদাঙ্গের যুগে রচিত কোনো ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মনে হয় তখন ব্যাকরণ বলতে প্রধানত রূপতত্ত্বকেই বোঝান হতো কারণ ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাখাই হল 'শিক্ষা' ও প্রাতিশাখ্য। ছন্দোবিজ্ঞান বেদাঙ্গের অন্যতম শাখা ছিল। কিন্তু সেখানে ছন্দের যে আলোচনা ছিল তা পূর্ণাঙ্গ নয়। ছন্দ সম্পর্কে প্রথম যথাযথ আলোচনা হয় পিঙ্গালের 'ছন্দঃসূত্রে'। কিন্তু বইটি বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের রচনা।

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যিনি প্রথম ব্যাকরণ রচনা করলেন তিনি পাণিনি। তাঁর ব্যাকরণের নাম অষ্টাধ্যয়ী অর্থাৎ আটটি অধ্যায় সম্বলিত পুস্তক। একথা সঠিকভাবে এখনও বলা যায় না যে পাণিনি নিজে এটা লিখেছিলেন অথবা মুখে মুখে বলেছিলেন। পাণিনির ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্যই তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনকাল নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনি ৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন—খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এতে আছে বীজগণিতের সূত্রের মতন প্রায় চার হাজার সূত্র। এই সূত্রগুলির অভিনবত্ব হল যথাসম্ভব কম কথায় এগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে আর সূত্রগুলির বিন্যাসরীতিও পাণিনির নিজস্ব। এতে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়েছে। তবে এটাও বলা যায় যে সূত্রগুলি এতটাই সংক্ষিপ্ত যে টীকাভাষ্যের সাহায্যে ছাড়া তাদের ব্যাখ্যা করা কঠিন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' হচ্ছে সেই টীকা যাকে বলা হয়েছে "Commentaries the commentaries"। সূত্রগুলি এতটাই সংক্ষিপ্ত যে প্রথমে এগুলিকে অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যাখ্যা করলে এর তাৎপর্য বোঝা যায়। এই অভিনবত্বের জন্য বিশেষ করে পাণিনি পাশ্চাত্য দেশের বিদগ্ধমহলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে রূপতত্ত্বে Zero-morpheme বা শূন্যবিভক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা তৈরি হয়েছে তার পূর্বাভাস রয়েছে অধ্যায়তে। পাণিনির মতে সব শব্দের মূলে একটা করে ধাতু রয়েছে। সব শব্দই, এমনকি নামশব্দও ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে বিভিন্ন শব্দের জন্ম হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধাতু থেকে জাত শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ সেখানে শূন্য বিভক্তি যোগ করে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা একে বলেছেন পাণিনির root-theory। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার গঠনমূলক বিশ্লেষণই করেছেন আর এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন যুগে তিনি যে মণীষা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আধুনিককালের অন্যতম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড বলেছেন 'The grammer of Panini...is one of the greatest monuments of human intelligence'।

১.৪ মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব

এই পর্বে নতুন চিন্তা-চেতনার বিকাশ বিশেষ হয়নি। লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোকে অনুসরণ করেই অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। বিশেষ করে প্রিস্কিয়ানের ব্যাকরণই সেকালে ব্যাকরণ রচনার আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোই যেসব ভাষার ব্যাকরণের আদর্শ স্বরূপে এইরকম একটা ধারণা মধ্যযুগে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত "Port Royal Grammer" এ। পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে ব্যাকরণের ধারা ছিল দার্শনিক তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত, পরে তা হয়ে দাঁড়াল নির্দেশমূলক ব্যাকরণ বা normative grammer। মোটের উপর একথা বলা যায়, মধ্যযুগে যা কিছু লেখা হয়েছিল তার বিচার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ছিল প্রাচীনযুগের মতোই, নতুন কোনো মাত্রা তাতে যোগ হয়নি। এযুগের তিনজন উল্লেখযোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী হলেন লিবনিৎস (G. W. Leibniz), হার্ডার (J. G. Harder) এবং উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones)।

যদিও লিবনিৎস (1646-1716) তাঁর কালের একজন বিদগ্ধ দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ রূপেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তবুও সেকালে প্রচলিত প্রায় সব বিদ্যাতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়েও তাঁর আগ্রহ কিছু কম ছিল না বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং তাদের ভাষাগত বংশতালিকা তৈরিতে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সেসময় এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে পৃথিবীর সব ভাষাই হিব্রুভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। লিবনিৎস তা মানতেন না। বরং তিনি বলেছেন, যেসব ভাষার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাদের পারস্পরিক তুলনা করে সম্ভাব্য মূল ভাষা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা যেতে পারে। তিনিই প্রথম বলেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি ভাষারই উৎসভাষা এক এবং পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলভিত্তি এই ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লিবনিৎস ইউরোপ, এশিয়া ও মিশরের ভাষাগুলির যে শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন তা ছাপা হয়েছিল ১৭১০ খ্রিঃ অব্দে বার্লিন আকাদেমির পত্রিকায়। লিবনিৎস বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজের মাতৃতভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত। তিনি নিজেও তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেছেন জার্মান ভাষায়, লাতিন অথবা ফরাসি ভাষায় নয়। এই দুটি ভাষা ছিল তখনকার বিদ্বৎসমাজের স্বীকৃত ভাষা।

অষ্টাদশ শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী হলেন জে.জি. হার্ডার (1744-1803)। 1772 খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পান। প্রবন্ধটির নাম Concerning the origing of language। সে সময় পণ্ডিতমহলে এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল—ভাষা সরাসরি ভগবানের দান। হার্ডার এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, ভাষা যদি ভগবানের দান হত তাহলে তা অনেকবেশি যুক্তিসম্মত হত। আবার মানুষই যে ভাষা আবিষ্কার করেছে তাও তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং তিনি মনে করেন ভাষা একটা স্বাভাবিক সৃষ্টি যা ভ্রূণাবস্থা থেকে আস্তে আস্তে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তিনি আরও মনে করেন মানুষই একমাত্র পারে তার অনুভূতিকে যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে। ভগবান মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আর মানুষ সেই শক্তিকে ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। হিব্রু যে পৃথিবীর প্রথম ভাষা এই ধারণা তিনি সমর্থন করেছেন।

১.৫ আধুনিক পর্ব

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি হলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স (1746-94)। উইলিয়াম জোন্স পেশায় ছিলেন একজন আইনজীবী। 1783 খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্য পর্যন্ত কলকাতার ব্রিটিশ কোর্টে জুরি হিসাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনের শেষ নয় বছর তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে গিয়ে তিনি যে শুধু ভাষাটিকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করেছিলেন তাই নয়, তিনি অনুভব করেছিলেন অন্য অনেক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গভীরতর সাদৃশ্য আছে। তাঁর এই ধারণার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়। বলা যায় এই বক্তৃতা থেকেই সূচনা হল আধুনিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের। এখান থেকে ভাষাবিজ্ঞানেরও আধুনিক পর্বের সূত্রপাত। সংস্কৃত ভাষা যে গ্রিক, লাতিন, জার্মানিক ভাষার সমগোত্রীয় ভাষা সেকথা প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন উইলিয়াম জোন্স-ই। এর আগে সংস্কৃত ভাষার কথা যে বিশ্ববাসীর জানা ছিল না তা নয়। কিছু কিছু লেখক সংস্কৃতভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় কোনো কোনো ভাষার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিষয়ে বিশদ কিছু বলেননি। জোন্স-ই প্রথম বললেন, সংস্কৃত ভাষার গঠনশৈলী অপরূপ এবং গ্রিক এবং লাতিন ভাষার সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও এদের থেকে সংস্কৃত ভাষা অনেক বেশি মার্জিত। এই তিনটি ভাষার মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য রয়েছে, যে সহজেই অনুমান করা যায় তারা একটা সাধারণ উৎসভাষা (some common source) থেকে জন্মলাভ করেছে, যে উৎসভাষাটির অস্তিত্ব এখন আর বর্তমান নেই। তিনি আরও বলেছেন, গথিক ও কেল্‌তিক ভাষাও এই একই উৎসজাত এবং

প্রাচীন পারসিক ভাষাকেও (old persion language) তিনি এই পরিবারের সদস্যভুক্ত করেছেন। এই বক্তৃতা দিয়েই শুরু হল তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং ঊনবিংশ শতকে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করল।

১.৫.১ ঊনবিংশ শতক

ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিকে যিনি প্রথম যথাযথভাবে প্রয়োগ করলেন তিনি হলেন আর. কে. রাস্ক (Rasmus Kristian Rask) - (১৭৮৭-১৮৩২)। ১৮১৪ খ্রিঃ অব্দে তিনি ড্যানিশ আকাদেমি অফ্ সাইন্স (The Danish Academy of Science) এ একটি প্রবন্ধ পাঠান। প্রবন্ধটির নাম "An Investigation into The Origin of the Old Norse or Icelandie Language." প্রবন্ধটির যে অংশে রাস্ক প্রাচীন আইসল্যান্ডিক ভাষার সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাষার এবং জার্মান উপভাষাগুলির কী সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং যে পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ণয় করেছেন তা যথেষ্ট কৌতূহলদ্দীপক। আধুনিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে তিনি প্রথম প্রয়োগ করেছেন যথাযথভাবে।

যে ভাষাটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে তার সামগ্রিক গঠন total structure নিয়ে যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার। শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু শব্দ তার প্রয়োগ নিয়ে সদৃশভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না—রাস্ক এই অভিমত পোষণ করেন। দুটি ভাষার মধ্যে যদি শব্দসম্ভারে যথেষ্ট মিল দেখা যায় তাহলেই তারা যে একই বংশোদ্ভূত এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা দুটি ভাষা যদি ভৌগোলিক দিক থেকে খুব কাছাকাছি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে শব্দের আদানপ্রদান হয় যাকে বলা হয় শব্দঋণ। এই মিল দেখে একথা বলা যাবে না যে তারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ভাষা অর্থাৎ একই উৎসজাত ভাষা। যে দুটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হবে তাদের মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য (grammatical agreement) কতখানি তা আগে বিচার করতে হবে। অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে একটি ভাষার শব্দসম্ভারে যত অনুপ্রবেশ ঘটে, ব্যাকরণগত সাদৃশ্য তত বেশি ঘটে না। দুই বা তার বেশি ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে রূপতত্ত্ব বা morphologyর আলোচনাই বেশি করা দরকার।

তুলনামূলক-পদ্ধতি প্রয়োগের নীতি কী হবে সে সম্বন্ধে রাস্ক যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এইরকম ঃ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে কিছু শব্দ আছে যাদের বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় অপরিহার্য শব্দ (essential and indispensable words)। যদি দুটি ভাষার এই অপরিহার্য শব্দের মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখা যায় বা একটি ভাষায় ওই ধরনের শব্দের কোনো ধ্বনি নিয়মিতভাবে অন্যভাষায় অন্য একটি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে বলা যাবে যে, ওই দুটি ভাষা একই উৎসজাত এবং তাদের মধ্যে একটা মৌলিক সম্পর্ক আছে। ড্যানিশ আকাদেমি অফ সাইন্স-এ রাস্ক যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন সেটা যদি ফরাসি অথবা জার্মান ভাষায় লেখা হত, তাহলে তিনি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা (founder of modern linguistics) এই আখ্যা পেতেন। এই সম্মান দেওয়া হয় জার্মান অধ্যাপক জ্যাকব গ্রিমকে (Jacob Grimm) যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে Girmm's Fairy Tales-এর সম্পাদকদের অন্যতম হিসাবে বেশি পরিচিত। গ্রিম জার্মান ভাষার একটি বিস্তৃত তুলনামূলক ব্যাকরণ লেখেন। (১৮১৯-৩৭)। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রাস্কের কাছে গ্রিম অনেকাংশে ঋণী। রাস্ক ধ্বনিগত পরিবর্তন সম্পর্কে যে তথ্য দেন, গ্রিম উদাহরণ ও সূত্রের সাহায্যে সেগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহযোগে পরিবর্তনের দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। গ্রিম তাঁর ব্যাকরণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া শব্দের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। সেখানে তিনি গ্রিক, লাতিন, জার্মান, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার ধ্বনির তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে জার্মান ও অ-জার্মান ভাষায় ধ্বনির পরিবর্তন অত্যন্ত নিয়মিত। জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রিম দেখলেন এগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় সমপর্যায়ের ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে আর সে

পরিবর্তন অবশ্যই ধ্বনিগত (phonetic) এবং নিয়মমাফিক (regular)। গ্রিম এই পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন sound shift গ্রিম নিজে অবশ্য কখনোই এই "Sound shift"-কে 'law' বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, "The sound shift is a general tendency, it is not followed in every case." পরবর্তীকালে তাঁর এই ব্যাখ্যা "গ্রিমের সূত্র" নামে পরিচিত হয়। গ্রিম দুধরনের সূত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে বলেছেন first sound-shift। আর জার্মান ভাষার তুলনায় ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয়েছে second sound-shift।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে নীচের উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে প্রতিনিধিত্ব করছে গ্রিক এবং জার্মানিক ভাষাকে গথিক।

গ্রিক	গথিক	
poús	fōtus	"foot"
treis	preis	"three"
Kardià	hairtō	"heart"
—	—	
déka	taikun	"ten"
génos	kuni	"race"
pherō	bairan	"bear"
thygátér	dauther	"daughter"
chórtos	gards	"yard"

ওপরের উদাহরণগুলিকে গ্রিম যে ধ্বনি পরিবর্তন বা sound-shift লক্ষ্য করেছেন তা হল

গ্রিক	গথিক
p	f
t	d
k	x
—	—
d	t
g	k
f	b
d	d
x	g

তালিকার তিনটি স্তরের ব্যঞ্জনধ্বনির আলাদা নামকরণ করেছেন গ্রিম। (p,t,k)-এই দলের নাম দিয়েছেন যাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় অঘোষ স্পর্শবর্ণ। (b,d,g)-এই দলের নাম দিয়েছেন যাদের আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় ঘোষ স্পর্শবর্ণ আর (f,d,x)-এদের বলা হয় উষ্মবর্ণ।

তালিকার দ্বিতীয় স্তরে প্রথম স্থানটি ফাঁকা রয়েছে। জার্মানিক ভাষার শব্দের গোড়ায় /p/ আছে এইরকম যেসব শব্দের উদাহরণ গ্রিম দিয়েছেন সেগুলো হয় ওই ভাষায় কৃতঋণ শব্দ অথবা তাদের সদৃশ কোনো শব্দ গ্রিক বা লাতিন ভাষায় পাওয়া যায়নি। তাই গ্রিম এরকম সিদ্ধান্ত করেছেন যে গোড়ায় /b/ আছে এইরকম শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই ছিল না। শুধু গোড়াতে নয়, মাঝখানে /b/ আছে এইরকম শব্দও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় খুব কম পাওয়া যায়। একমাত্র উদাহরণ গ্রিম দিয়েছেন গ্রিক kannabis : Old Nose hampr/ গ্রিম নিজে কখনও ইন্দো-ইউরোপীয় এবং জার্মানিক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির এই সাদৃশ্যকে "law" বলেননি। এমন কথাও বলেন নি যে এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। বরং তিনি বলেছেন, "A sound-shift is generally valid, but never clean-cut." Second sound-shift ওল্ড-হাই জার্মান ভাষায়। অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের কিছু অংশ নিয়ে সমগ্র মধ্য ও উত্তর জার্মানিতে এই ওল্ড-হাই জার্মান ভাষা বলা হত। শব্দের মধ্যে বা শেষে জার্মান ভাষায় অঘোষ স্পর্শবর্ণ [p], [t], [k] ওল্ড হাই জার্মান ভাষার অঘোষ উষ্মবর্ণ [f], [θ], [x]-তে পরিণত হয়। আর শব্দের গোড়ায় বা ব্যঞ্জনবর্ণের পর থাকলে যথাক্রমে খ্রিস্টবর্ণ (affriacates) [pf], [ts], [kx]-তে পরিণত হয়। একটা তালিকার সাহায্যে এই ধ্বনি-পরিবর্তন দেখানো যেতে পারে।

জার্মানিক		ওল্ড হাই জার্মান	
opan		offan	'open'
etan	শব্দের	essan	'eat'
makon	মধ্যে	machon	'make'
শব্দের গোড়ায় ঃ—			
pund		pfunt	'pound'
tehan	শব্দের	zehan	'ten'
kō	মধ্যে	chō	'cow'

first sound shift এবং second-shift-কে একত্রে একটি বৃত্তের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেছেন Jacob Grimm। তাই তিনি এর নাম দিয়েছেন Kreislanf অর্থাৎ revolution বা circulation.

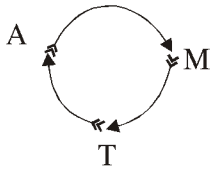

উপরের বৃত্তে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে জার্মানিক এবং জার্মানিক থেকে ওল্ড হাই জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দেখতে হলে এক ধাপ করে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দে যদি 'A' থাকে তাহলে জার্মানিক ভাষায় তা হবে 'M' আর ওল্ড-হাই-জার্মানিক ভাষায় হবে 'T'। A =/Aspiratae যাকে সহজভাষায় বলা যায় 'Spirnat' বা উষ্মবর্ণ ; (M = Medial) অর্থাৎ ঘোষ স্পর্শবর্ণ এবং T = Tamues অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ। নীচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। দুটিকে একত্রে এভাবে দেখানো যেতে পারে।

ইন্দোইউরোপীয়	T	M	A
জার্মানিক	A	T	M
ওল্ড হাই জার্মান	M	A	T

উদাহরণ ঃ—

গ্রিক	phrātōr	deka	thygater
গথিক	brōpar	taihen	dauhtar
ওল্ড হাই জার্মান	bruoder	zehan	tohter

ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রিমের এই ব্যাখ্যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। গবেষকরা অনুভব করলেন ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন কখনোই এলোমেলোভাবে ঘটতে পারে না, সবসময়েই একটা নির্দিষ্ট নিয়মেই সেই পরিবর্তন ঘটে থাকে।

ফ্রানৎস্ বপ ঃ রাস্ক বা গ্রিম কেউই সংস্কৃত ভাষাকে তাদের আলোচনার মধ্যে আনেন নি। অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনা কখনোই সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। যিনি প্রথম এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখলেন, তিনি হলেন জার্মান অধ্যাপক ফ্রানৎস বপ (1791-1867)। ১৮৩৩ খ্রিঃ অব্দে তিনি লিখতে শুরু করেন Comparative Grammer of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithanian, Gothic and German এবং শেষ করেন ১৮৫২-য়। ১৮৫৭ এবং ১৮৬৮ খ্রিঃ অব্দে পরবর্তী দুটি সংস্করণ বেরোয় এবং তখন বপ তাঁর ব্যাকরণে প্রাচীন স্লাভিক, কেলতিক এবং আলবেনীয় ভাষার আলোচনাকে জুড়ে দেন। তিনি প্যারিসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে লন্ডনে যান সংস্কৃত পুঁথি পড়তে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হল ১৮২১ খ্রিঃ অব্দে। বপের প্রধান আগ্রহ ছিল রূপতত্ত্বে (Morphology)। বপ শব্দের গঠনকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং শব্দের সাথে যে বিভক্তি যোগ করা হয় তাদের পৃথক করেছেন। পরে দেখেছেন এই বিভক্তিগুলির উৎস কি এবং তাদের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এটা মানতেই হবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বপ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয় অর্থাৎ কখনো কখনো তিনি অসফল হয়েছেন। যেমন, সব ক্রিয়াপদের মধ্যেই তিনি "to be" ক্রিয়ার অস্তিত্ব কোনওভাবে রয়েছে বলে মনে করেন। একটা বাক্যের মধ্যে থাকে কর্তা ও কর্ম যাদের যোগ করে একটি ক্রিয়া। তাই ক্রিয়াকে তিনি বলেছেন সংযোজক। বপ সংস্কৃতভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। শব্দবিচারে ও বিশ্লেষণে তিনি সংস্কৃতি ব্যাকরণের পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধির সাহায্যে শব্দের যে বিশ্লেষণরীতি অনুসরণ করা হয় তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। ইন্দো-ইউরোপী ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃত ও ইরানীয়ভাষার অন্তর্ভুক্তির ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা এই সময়ে এক নতুন মোড় নিল।

উইলহেম ভন হুমবোল্ট (Wilhelm Von Humboldt ১৭৬৭-১৮৩৫) ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। ভাষাবিচারে তিনি এক নতুন আদর্শ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ভাষা কোনো বস্তু নয়, বরং একটা সক্রিয়তা। (language is not a thing, but an activity) অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে মেধার সক্রিয় গঠনমূলক শক্তি। হুমবোল্ট অনেকগুলো ভাষা জানতেন, তার মধ্যে কিছু আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষাও ছিল। ভাষার বিচিত্র গঠন বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন—On the variety of human Language Structure। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে ভাষা সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। ভাষাকে শুধুমাত্র ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যের একটা বহিরঙ্গ আচ্ছাদিত রূপ হিসেবে দেখেননি হুমবোল্ট। তাঁর মতে ভাষার একটা অন্তর্নিহিত গঠন (inner speech form) আছে এবং তার সঙ্গে মানবমনের গভীর যোগ আছে। তাই ভাষাকে তিনি

মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃজনীশক্তির প্রকাশরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে ভাষার ক্ষেত্রে শব্দগুলো হচ্ছে তার raw materials বা কাঁচামাল। সেগুলোকেই প্রত্যেক ভাষার গঠন এবং নিয়ম অনুযায়ী সুসংবদ্ধ করতে হয়। আর এই গঠন এবং তার নিয়ম একটা ভাষাকে অন্যটার থেকে পৃথক করে। এই চিন্তাধারা থেকে বা চরিত্র হিসেবে ভাষার শ্রেণিবিন্যাস করতে আগ্রহী হয়েছিলেন হুমবোল্ট এবং তাঁর origin of grammatical forms and their influence on the development of thought (1822) বইতে তিনি ভাষার কালানুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন। পৃথিবীর ভাষাগুলির যে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে তাদের মধ্যে একদিকে আছে চিনা ভাষা যা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক (analytic) এবং যাকে বিচ্ছিন্ন ভাষাও (isolating language) বলা যেতে পারে। আর অপরদিকে আছে সংস্কৃত ভাষা যা সম্পূর্ণ সবিভক্তিক এবং সংশ্লেষাত্মক (synthetic) ভাষা। এই দুই ধরনের ভাষার মাঝখানে আছে agglutinative languages বা সংযোগমূলক ভাষা। হুমবোল্ট প্রধানত সবিভক্তিক inflectional ভাষা নিয়ে বেশি আলোচনা বা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এই সমস্ত ভাষায় বিভক্তি যোগ করে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। তাঁর মতে সংস্কৃত প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে সবথেকে উন্নত। সমস্ত ভাষাতেই শব্দ হচ্ছে চিন্তা বা মননের দৃষ্ট রূপ। সেই শব্দগুলো নির্দিষ্ট রীতিতে সাজানো থাকে একটা বাক্যের মধ্যে যেখানে বাক্যই হচ্ছে একটা একক (unit)। হুমবোল্ট মনে করেন ভাষার মাধ্যমেই মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে। আর মানুষের মধ্যে ভাষাসৃষ্টির এই অপরিসীম ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ সীমাবদ্ধ উপাদানের দ্বারা অগণিত বাক্য সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানে এই তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাই শুধু তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নয়, পাশ্চাত্যে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হুমবোল্ট একজন উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী ভাষাবিজ্ঞানী।

তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃত ও ইরানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির দ্বার ফ্রানৎস বপ তুলনামূলক পদ্ধতির যে বিস্তৃতি ঘটান, তাকে আরও পরিপুষ্টি দান করেন উনিশ শতকের অন্যতম ভাষাতত্ত্ববিদ অগাস্ট শ্লেইশার (August Scheleicher ১৮২১-৬৮)। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন যার মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল Comendium of the comparative grammer of the Indogermeniei languages. (১৮৬১) যৌবনে তিনি অনেকগুলো ইউরোপীয় ভাষা শিখেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ করে লিথুয়ানীয় ভাষা সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন এবং তাঁর লেখা Handbook of the Lithunian languages এ সম্বন্ধে প্রথম তথ্যবহুল গ্রন্থ যাতে ভাষাটি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আছে।

ভাষাতত্ত্ব ছাড়া শ্লেইসার আরও যে দুটি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন সেদুটি হল দর্শন (Philosophy) এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান (natural science)। হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বাসী শ্লেইসার তাঁর পরিণত বয়সে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন চার্লস ডারউইন-এর দ্বারা। ডারউইন এর তত্ত্বের সঙ্গে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাদৃশ্য দেখেছিলেন তিনি। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বই Darwinian Theory and Linguistics.

ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্লেইশার এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তিনটি বিষয়ে (১) ভাষার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব (Theory of language-relationship) (২) তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে মূলভাণ্ডার পূর্ণগঠন (his "comparative method" of reconstructing a parent language) এবং চরিত্রভেদে ভাষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of languages into types বা taxanomy)

শ্লেইশার মনে করেন ভাষা তার বিবর্তনের পথে স্বাধীন ও সজীবভাবে এগিয়ে চলে ঠিক যেমন একজন উদ্ভিবিদ মনে করেন উদ্ভিদ ও খুব স্বাভাবিক পথে ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে। যখন দুটো ভাষার মধ্যে সমশ্রেণির কিছু সংখ্যক সদৃশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তখন উভয় ভাষাই একটা পারস্পরিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি ভাষার প্রাচীন স্তর পর্যবেক্ষণ করেন,

কিন্তু এক পর্যায়ে তার চেয়ে পেছনে গিয়ে ভাষার উপশাখা-নির্ণয় আর সম্ভবপর হয় না। এভাবে তিনি একটি ভাষা-পরিবারের মূলভাষাকে নির্দিষ্ট করতে পারনে। বিশেষত "family tree" Theory বা 'পরিবার বৃক্ষ' নকশার সাহায্য ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নেন এবং বংশগত তালিকা তৈরি করে ভাষাগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট করেন। যে সমস্ত ভাষা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য বহন করছে তাদের সেই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উৎসভাষার একটা রূপ পুনর্গঠন করা হয়। শ্লেইশার-এর পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়ে যে ওই উৎস ভাষার কোনও উপভাষা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষা সম্প্রদায়ই উপভাষাহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও উৎসভাষাটি কালক্রমে দুই বা ততোধিক কন্যা-ভাষায় (daughter-language) রূপান্তরিত হয় এবং সেই জ্ঞাতিভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না। তারা নিজেদের পথে এগিয়ে যেতে যেতে এক একটি স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু উৎসভাষার সঙ্গে তাদের একটা পরিচয়সূত্র থেকেই যায়। পরবর্তীকালে এই জ্ঞাতিভাষা গুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে অর্থাৎ তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ে উৎসভাষা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তৈরি করে নেওয়া হয়।

হেগেলের দর্শনে বিশ্বাসী শ্লেইশার যেভাবে ভাষার রূপতত্ত্বগত শ্রেণিভাগ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শ্লেইশারের মতে ভাষা তৈরি হচ্ছে শব্দ এবং অর্থ নিয়ে। অর্থহীন কোনো ভাষা হতে পারে না, এই শব্দ ও অর্থের প্রয়োগ অনুসারে শ্লেইশার তিন ধরনের ভাষার অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হেগেলের triads বা 'ত্রয়ী' মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। প্রথম ধরনের ভাষায় শব্দের ব্যাকরণগত উপাদানের কোনো অর্থই বাক্যের সামগ্রিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয় না। চিনা ভাষা এই ধরনের ভাষা। সেখানে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ অবস্থানে শব্দটি বসেছে তাই নির্ধারণ করে দেবে তার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, তার আলাদা কোনো অর্থ থাকে না। শ্লেইশার এই ধরনের ভাষাকে বলেছেন বিচ্ছিন্ন ভাষা বা Isolating language।

দ্বিতীয় ধরনের ভাষায় ভাষিক উপাদানগুলি পরপর যুক্ত হয়ে একটি শব্দবাক্য তৈরি করে এবং সেখানে প্রত্যেকটি উপাদানেরই নিজস্ব অর্থ আছে এবং ব্যাকরণগত একটি ভূমিকাও আছে। এই ধরনের ভাষার নাম দিয়েছেন শ্লেইশার "agghutinative" languages বা সংযোগমূলক ভাষা। তুর্কি ভাষা এই ধরনের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভাষায় বা ভাষাগুচ্ছে মূল শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে এবং তার সঙ্গে যে উপাদানগুলি যুক্ত হয় তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থ আছে।

তৃতীয় ধরনের ভাষায় শব্দের অর্থ এবং গঠনের সমন্বয় ঘটেছে। এই ধরনের ভাষায় অনেকসময় শব্দমূলের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে (যেমন ইং sing-sang-sung) আবার শব্দমূলের আগে, পরে অথবা মধ্যে উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে। এই সংযোগের ফলে শব্দটির অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটাও মনে রাখা দরকার, এই উপসর্গ বা অনুসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। এই ধরনের ভাষাকে শ্লেইশার বলেছেন "inflectional language" বা সবিভক্তিক ভাষা। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত এই ধরনের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের ছাত্র শ্লেইশার জানতেন যে, সমস্ত কোষবদ্ধ জীবেরই জন্ম-বৃদ্ধি-বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু অনিবার্য। এর সঙ্গে তিনি মিলিয়েছিলেন হেগেলের সেই তত্ত্বকে যেখানে তিনি বলেছেন সমস্ত রকম প্রগতি মানে একটা বিপরীত শক্তির (যাকে বলেছেন dialectic) অবিরাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শ্লেইশার ভাষার ক্ষেত্রেও এই তিনটি শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। ভাষা যখন প্রথমে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির (isolating nature) ছিল তখন ছিল thesis। তারপর একটু জটিল প্রকৃতির হল অর্থাৎ যে পৌঁছালো সংযোগমূলক পর্যায়ে বা agglutinative

stage-এ ; এই পর্যায়কে তিনি বলেছেন antithesis। সবশেষে এসে পৌঁছালো সবিভক্তিক পর্যায়ে, যে পর্বকে তিনি বলেছেন synthesis। এরপরেই প্রশ্ন ওঠে আমরা তাহলে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষার কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছি। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর হল সবিভক্তিক পর্যায়ে। শ্লেইশার সবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাচীন ইন্দো-উইরোপীয় ভাষাগুলি বিভক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত ভাষার শব্দরূপ বা ধাতুরূপের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

শ্লেইশারের অনুসৃত তুলনামূলক পদ্ধতি তাঁর পরবর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকাংশেই অনুসরণ করেছেন। এমনকি, বেশির ভাগ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর "Proto-Indo-European" বা প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠনকে মেনে নিয়েছেন। একটা ভাষা তার জীবনপর্যায়ে বিবর্তনের যে স্তরকে অতিক্রম করে বলে তিনি মনে করেন তার অনেকাংশই সমর্থনযোগ্য, যদিও সর্বাংশে নয়। ভাষা একটি জীব নয়, তার ধ্বংস নেই কিন্তু তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শ্লেইশারের 'পরিবার-বৃক্ষ' তত্ত্ব বা 'family tree' theory প্রয়োগ করে যিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি তুলনামূলক অভিধান রচনা করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি হলেন অগাস্ট ফিক (August fick ১৮৩৩-১৯১৬) তাঁর লেখা অভিধানটির নাম Comparative Dictionary of the Indo-European language, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। অভিধানটির তৃতীয় সংস্করণ আরও বৃহৎ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-৭৬ খ্রিস্টাব্দে। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯০ তে প্রকাশিত হতে শুরু হয় কিন্তু শেষ হয়নি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলিকে তিনি প্রধান দুটি শাখায় বিন্যস্ত করেছেন—১) ইন্দো-ইরানীয় এবং ২) সাধারণ ইউরোপীয় ভাষা। পরে ফিক সাধারণ ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে দুটি শাখায় বিভক্ত করেছেন ১) দক্ষিণ ইউরোপীয় (গ্রিস-ইতালিক) এবং উত্তর ইউরোপীয় (জার্মান-বালতিক-স্লাভিক)। যে সমস্ত শব্দ ইন্দো-ইরানীয় এবং সাধারণ ইউরোপীয় ভাষার যে-কোনো শাখাতেই বর্তমান রয়েছে শুধুমাত্র তারাই-মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত ছিল দাবি করেন ফিক।

প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি (Phonology) ও তার পুনর্গঠন নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর লেখা A study of the primitive Vowel System of the Indo-European Lnaguages. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে যে গুণ-বৃদ্ধি সম্প্রসারণ ঘটে অর্থাৎ স্বরধ্বনির যে গুণগত (qualitative) ও মাত্রাগত (quantitive) পরিবর্তন হত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সোস্যুর।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনিস ভাষাতত্ত্ববিদ কার্ল বেরনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন "An exception to the first consonant shift" মূল প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় লেখা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে জ্যাকব গ্রিম তাঁর এ যে ধ্বনি পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন, গ্রিক Pater (সংস্কৃত pita(r) গথিক fadar -এখানে দেখছি শব্দের গোড়ায় অঘোষ স্পর্শ বর্ণ অঘোষ উষ্ম বর্ণে পরিণত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী আঘোষ বর্ণ /t/ ঘোষ উষ্ম বর্ণ /d/-এ পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রিম এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সেই ব্যাখ্যা দিলেন কার্ল বেরনের তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে। তিনি বললেন, যদি প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যঞ্জনের ঠিক পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির ওপর ঝোঁক না পড়ে, তাহলে জার্মানিক ভাষার অঘোষ স্পর্শ বর্ণ ঘোষ উষ্ম বর্ণে পরিণত হয় এবং ইন্দোইউরোপীয় ভাষার /ৎ/ ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় /z/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ

গ্রিক patēr,	সংস্কৃত pitá :	গথিক fadar, OHG, fater
গ্রিক heptá,	সংস্কৃত Saptá :	গথিক sibun, OHG, Sibun
গ্রিক hekura,	সংস্কৃত śraśrús :	প্রাচীন ইং sweger, OHG, Swigur

আবার, গ্রিক muós (dauther-in-law) সংস্কৃত Snusá :

প্রাচীন ইংরেজি snoru, OHG, snura এখানে মনে রাখতে হবে ইন্দো ইউরোপীয় /s/ জার্মানিক ভাষায় /z/ এ পরিণত হয়েছে এবং এই /z/ প্রাচীন ইংরেজি বা ওল্ড হাই জার্মান ভাষায় /r/ এ পরিণত হয়েছে।

গ্রিমের সূত্র প্রয়োগ করে সর্বক্ষেত্রে জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি। যেসব জায়গায় ব্যতিক্রম দেখা গেল, সেই ব্যতিক্রমগুলির পেছনেও যে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে তা দেখালেন কার্ল বেরনের। অর্থাৎ কোনো ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের পেছনেই কোনো না কোনো কারণ আছে, তাই ধ্বনিসূত্রের কোনো ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে, তাও যে একটা নিয়মের ফসল—এই মতবাদ নিয়ে ঊনবিংশশতকে জার্মানিতে একত্রিত হন একদল নতুন বৈয়াকরণ। প্রাচীনপন্থী বৈয়াকরণেরা এঁদের ব্যঙ্গ করে বলতো নব্য বৈয়াকরণ বা "neogrammarians" (Junggrammatiker ছোকরা বৈয়াকরণ)। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এঁদের একজন সদস্য অগাস্ট লেসকিন্ (August Leskein) বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, "Sound-laws have no exception" অর্থাৎ ধ্বনিসূত্রের কোনো ব্যতিক্রম নেই। ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন কখনোই বিশৃঙ্খলভাবে বা আকস্মিকভাবে ঘটতে পারেনা। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে সেগুলিও কোনও না কোনও নিয়মের ফসল। প্রত্যেক পরিবর্তনের পেছনেই একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে, শুধু প্রয়োজন সেই কারণটিকে অনুসন্ধান করে বের করা। নব্যবৈয়াকরণদের মতানুসারে যে সমস্ত কারণ ধ্বনিপরিবর্তনের ব্যতিক্রম ঘটাতে ক্রিয়াশীল তাদের অন্যতম হচ্ছে সাদৃশ্য বা analogy, মনস্তাত্ত্বিক মতে সাদৃশ্য হচ্ছে ভাষাতত্ত্বে একটা সহজ অনুষঙ্গ। সাদৃশ্যের কারণে ভাষার অনেক সময় ধ্বনির (pheneme), রূপের (morph) এমনকি অন্বয়েরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেই পরিবর্তনকে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। ভাষার ইতিহাসে ধ্বনিগত ও সাদৃশ্যগত পরিবর্তন নব্যবৈয়াকরণদলের কাছে প্রধান বিষয়রূপে গৃহীত হয়। এই দলের ভাষা বিশ্লেষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা ও ভাষার শারীরিক প্রকৃতির প্রেক্ষিতে পরিবর্তন নির্দেশ করা। সাদৃশ্যের দ্বারা ভাষায় কাছাকাছি দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনির অথবা প্রত্যয়/বিভক্তির অথবা অর্থের বা অনেক সময় অন্বয়েরও সাদৃশ্য ঘটানো হয়। লাতিনে একজোড়া শব্দ 'gravis' (heavy) এবং 'levis' (light)-যারা অর্থের দিক থেকে বিপরীতধর্মী। পরবর্তীকালে 'gravis' শব্দটি 'levis' এর সাদৃশ্যে হোল* 'gravis' আর তার থেকে প্রাচীন ফরাসি ভাষায় (old french-এ) শব্দটি দাঁড়ালো 'gref'-যার থেকে ইংরাজি শব্দটি grief এসেছে।

গ্রিকে এই রকমই বিপরীত অর্থের দুটি শব্দ হোল 'prosthen' (infront) এবং 'opisthen' (in back) এখানে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত, কেননা শব্দটি মূলত ছিল 'opithen'।

সাদৃশ্য ছাড়াও অনেকসময় অন্যকারণেও ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়। যেমন, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির পরবর্তী /s/ লাতিনে যদি দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে বসে তাহলে /r/ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন ই-ইউ flōs "flower" লাতিনে সম্বন্ধের একবচনে হয় 'floris' genus "race" ষষ্ঠীর একবচনে হয় লাতিনে generis। কিন্তু লাতিনে এমন অনেক শব্দ আছে যেখানে দুটি স্বরমধ্যবর্তী /s/ বজায় আছে, যেমন m*i*si (I sent) বা causa (cause)। আপাতদৃষ্টিতে এদের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। কিন্তু ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শব্দটি মূলত এসেছে *m*i*ssi (মূল শব্দ m*it*si) থেকে। আর লাতিনে স্বরধ্বনি বা যৌগিকস্বরের পর long consonant অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি একই ব্যঞ্জন থাকলে তারা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। কাজেই এই শব্দদুটিকে কোনোভাবেই নিয়মের ব্যতিক্রম-বাহক বলা যায় না।

ভাষাঋণ ঃ অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে অনেকসময় গ্রহীত ভাষায় মৌলিক শব্দের নানারূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনের এটাও একটা কারণ। যেমন, লাতিন ভাষায় 'philosophus',

'genesis' প্রভৃতি শব্দে দুটি স্বরের মধ্যবর্তী [s] বজায় আছে। দুটি শব্দই গ্রিক ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ। কাজেই এই ধরনের শব্দে যে ব্যতিক্রম ঘটেছে তা আদৌ ব্যতিক্রম নয়। এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভাষার ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা যে দেওয়া হচ্ছে তা নয়। তবুও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন মনে করেন, যে তুলনামূলক পদ্ধতিই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি ভাষাবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, সেইরকম নব্যবৈয়াকরণরাও মনে করেন ধ্বনিসূত্রের আপাত কোনো ব্যতিক্রম নেই। যেখানে ব্যতিক্রম আছে মনে হচ্ছে সেটাও অন্য একটি নিয়মের আওতায় পড়ে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাবে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ঘটে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় হেরমান পল (Hermann Paul)-এর লেখা Principles of Linguistic History-র প্রথম সংস্করণ। ভাষাগত পরিবর্তনের বিশদ সমীক্ষা করা হয়েছে এই বইটিতে। ভাষার ধ্বনিগত, সাদৃশ্যজনিত এবং অর্থগত-সব ধরনের পরিবর্তন নিয়েই আলোচনা আছে বইটিতে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল কার্ল ব্রুগমান (Karl Brugmann) এবং বের্থোল্ড ডেলব্রুক (Berthold Delbruck) এর লেখা শীর্ষস্থানীয় বই Comparative Indo-European Grammer। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বই হেরমান হার্ট (Hermann Hirt) এর Indogermanic Grammer। বইটি সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তবে এই পর্বে সর্বাধিক খ্যাতিমান ভাষাতাত্ত্বিক হলেন সরবোন অধ্যাপক আন্তোনিও মাইয়ে (Antoine Meillet)। তাঁর লেখা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক সমীক্ষার ভূমিকা অর্থাৎ Introduction to the Comparative Study of Indo-European তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে ধ্রুপদী মর্যাদার অধিকারী। ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বইটিতে আলোচিত হয়েছে।

১.৫.২ বিংশ শতাব্দী

উনিশ শতককে যদি বলা হয় ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ তাহলে বিংশশতক হচ্ছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গৌরবময় যুগ। উনিশ শতকের ভাষাচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিকরা মনস্তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবকে একেবারে এড়াতে পারেননি। কিন্তু বিংশ শতকে ভাষাতাত্ত্বিকরা স্বতন্ত্র একটা শৃঙ্খলার সাহায্যে ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভাষাতত্ত্বের আদর্শ অন্যান্য তত্ত্বীয় শাস্ত্রের ওপরেও সমপরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে। উনিশশতকের ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাচর্চার মুখ্যত ইন্দোইউরোপীয় ভাষার ওপর প্রাধান্য দিলেও বিংশ শতকের ভাষাতাত্ত্বিকরা সমকালীন ভাষার বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণে আসক্তি দেখালেও ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বিচারেও ভাষার সামগ্রিক বিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিংশ শতকে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক আলোচনার চেয়ে বুৎপত্তিতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, রূপমূলকতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সেমিওলজি, শব্দপরিসংখ্যানতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষতত্ত্ব, রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ ও প্যারালিংগুয়িস্টিক্স-এর বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। বিংশ শতকে ভাষাবিজ্ঞানচর্চার যে ধারার সূত্রপাত হয় তাকে বলা হয় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান Deseriptive Linguistics। এই "deseriptive" বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে W.V. Humboldt বলেছেন, "The analysis of language as an internally articulated organims." ভাষাবিশ্লেষণের এই নতুন পদ্ধতির নাম গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ববিদরা মূলধ্বনি বিচারের সূত্রপাত করেন বলে এই শ্রেণির পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও প্রসারের ইতিহাসের মধ্যে মূলধ্বনির তাত্ত্বিক ও রূপগত দিকটি স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯৩০ সালের আগেই ইউরোপ ও আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞাত তথ্যের ওপর নির্ভর করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞাত তথ্যাবলির নিয়মের মধ্যে

সেগুলির ক্রিয়াগত দিক এর পুনর্বিচার প্রাধান্য পায়। এছাড়াও, গঠনবিদ ভাষাতাত্ত্বিকরা ঐতিহাসিক ও সমকালীন ভাষাতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করেন। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনা দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯২৩)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোস্যুরের মৃত্যুর পর তাঁর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন তাঁর দুই ছাত্র শার্ল্ বাল্লি ও আল্বেয়র্ শেসেই (Charles Bally and Albert Sechehaye)। জেনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর নতুন মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বক্তৃতাগুলি দেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েড বাস্কিন (Wade Baskin) বইটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন নিউইয়র্ক থেকে Course in General Linguistics নামে। সোস্যুরে প্রথমেই কালানুক্রমিক ও এককালিন ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পার্থক্য তা ব্যক্ত করেন এবং প্রধানত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি সূত্রবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিভিন্ন উপাদান খণ্ড খণ্ড করে আলোচনা করতেন অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান বিশ্লেষণের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। সোস্যুরই প্রথম বলেন যে, ভাষার খণ্ড খণ্ড উপাদান একসঙ্গে মিলে এক অখণ্ড রূপের সৃষ্টি হয় আর সেই অখণ্ড রূপেই ভাষার সামগ্রিক তাৎপর্য বিদ্যমান। ভাষার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সার্থকতাই বহন করে না। তাঁর প্রবর্তিত এই রীতিকে তাই অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান (Macro-Linguistics) এর রীতি বলা যায়। এই অখণ্ড ভাষা দৃষ্টির প্রতিষ্ঠাই সোস্যুরের মৌলিকতম অবদান।

সোস্যুরের প্রধান কীর্তি হল ভাষার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ। তিনি প্রথমে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চেয়েছেন এই মীমাংসায় যে, 'ভাষা' বলতে সঠিক কী বোঝায়। তাঁর মতে 'ভাষা' হচ্ছে দুটি মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। সেই শব্দগুলি শ্রোতার কানে পৌঁছানোর পর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এইভাবে ভাষা হয়ে ওঠে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। ভাষা চিন্তাও তার প্রকাশের মধ্যে একটা সেতুস্বরূপ বিদ্যমান। এই ধারণা (concept) ও প্রকাশ (expression) এর একটা আলাদা নাম দিয়েছেন সোস্যুর। Concept বা ধারণাকে তিনি বলেছেন 'signified' আর expression কে বলেছেন 'signifier' বক্তার মনের ধারণা বা ভাবনা রূপ পায় তার মুখে উচ্চারিত ধ্বনিতে আর সেই ধ্বনিসমষ্টির বা শব্দাবলির একটা নিজস্ব অর্থ আছে ; সেই অর্থে ধারণ করেই তা পৌঁছে যায় শ্রোতার কাছে, এই ভাবে চলে ভাবের আদানপ্রদান। কাজেই 'অর্থ' বা meaning এখানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে যে শব্দাবলি সোস্যুর তাদের নাম দিয়েছেন "linguistic sign" বা ভাষিক চিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে ভাষাবিজ্ঞান বা linguistics হচ্ছে এই প্রতীকেরই বিস্তৃত পাঠ। এখন এই গুলির অর্থাৎ শব্দের প্রকৃতি (nature) কী হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সোস্যুর। প্রথমত তিনি অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, এই চিহ্নগুলি হচ্ছে বিধিবহির্ভূত (arbitrary)। ভাষার এই চিহ্নগুলি অর্থাৎ শব্দগুলি হল আসল সম্পদ আর তারাই গড়ে তোলে একটা ভাষার বিশাল শব্দভাণ্ডার। কিন্তু উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে এই যে প্রত্যেক ভাষারই উৎস নিহিত আছে অতীতের কোনো ভাষার মধ্যে। কাজেই বক্তা যে শব্দাবলী ব্যবহার করে তাতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর সে পরিবর্তন আকারেও হতে পারে, অর্থেও হতে পারে। কারণ হিসেবে সোস্যুর বলেছেন শব্দ এবং তার অর্থের মধ্যে যে যোগসূত্র সেটা অনেকটাই দুর্বল। যে-কোনো কারণেই তা শিথিল হতে পারে। শব্দের অর্থ অনেকটাই নির্ভর করে তার প্রতিবেশের ওপর। একটা concept বা ধারণাকে আমরা প্রকাশ করি একটা বাক্যে আর সেই বাক্যে-ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রত্যেকটির অর্থের সামগ্রিক যোগফল হচ্ছে সেই বাক্যটির অর্থ।

ভাষার, প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সোস্যুর 'পাসল' (psole = উক্তি) এবং লাঁগ (langue = ভাষা) এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ভাষার দ্বিধারিত অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথমে রয়েছে জীবন্ত ভাষাটির প্রবাহ। এই জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করছে প্রত্যেক বক্তা। ব্যবহারের সময় একজনের ভাষা অপরজনের থেকে আলাদা হয়ে

যাচ্ছে। প্রত্যেকের ব্যবহৃত ভাষার নাম তিনি দিয়েছেন 'পালস' (pasole) আর সামগ্রিক ভাষার যে রূপ যা এই সমস্ত বা ব্যক্তিভাষার সামগ্রিক যোগফল তাকে সোস্যুর বলেছেন লাঁগ (langue); যেমন, জার্মান ভাষা, ইংরাজি ভাষা, বাংলা ভাষা ইত্যাদি। এই ভাষা কোনো একজনের ভাষা নয়, তা হচ্ছে নির্বস্তুক ভাষাগত গঠন-প্রক্রিয়া, যার অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের ভাষা থেকে স্বতন্ত্ররূপে সংরক্ষিত। এই লাঁগ সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে একটি সামাজিক ব্যাপার।

ভাষা সমাজেরই প্রতিফলন। তাই এই ভাষার সমীক্ষা কোন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটছে তার ওপর নির্ভর করে সোস্যুর 'সমকালীন' 'অতীতকালীন' এই দুই ধরনের ভাষা-সমীক্ষার কথা বলেছেন। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমায় যদি ভাষার সমীক্ষা চলে তাহলে তাকে তিনি বলেছেন সমকালীন পর্যবেক্ষণ বা synchonic study । আর যদি অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত কোনো ভাষার বিবর্তনের রূপরেখাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই পর্যবেক্ষণকে তিনি বলেছেন অতীতকালীন পর্যবেক্ষণ বা diachronic study। সমকালীন ভাষাতত্ত্বকে বর্ণনামূলক ও অতীতকালীন ভাষাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সোস্যুর স্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন যে দুটো ভাষাতত্ত্বীয় আদর্শ দুটো অক্ষের ওপর দণ্ডায়মান, তাই একই পদ্ধতির প্রয়োগে তাদের বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় এবং উভয় শ্রেণির ভাষারীতির সমীক্ষার সীমানা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা উচিত। যেমন, ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনাকে তিনি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণরূপে চিহ্নিত করতে চান। ধ্বনিগত পরিবর্তন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, আর এই পরিবর্তন বিভিন্নযুগের ভাষাভাষীদের অজান্তেই ঘটে থাকে।

সোস্যুরের মতে একটা বাক্য হচ্ছে কতকগুলি শব্দের সমষ্টি—যে শব্দগুলিকে তিনি বলেছেন linguistic signs। অর্থ এবং প্রয়োগের দিক থেকে এই শব্দগুলির দুধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন সোস্যুর (১) syntagmatic relationship বা পদবিন্যাসগত সম্পর্ক এবং paradigmatic relationship বা ব্যাকরণগত বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

Syntagmatic relationship একটা বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কটি স্থিরীকৃত হয় প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব structure-এর ওপর। একটা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক পদবিন্যাসগত যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে বলা হয় syntagmatic relationship। 'আমি কাল যেতে পারি' এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ বা 'sign' পরস্পরের সঙ্গে এক সুশৃঙ্খল সম্পর্কে যুক্ত। ভাষার গঠন-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে এদের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—সর্বনাম + কালগত ক্রিয়াবিশেষণ + প্রধান ক্রিয়া + সহায়ক ক্রিয়া। প্রত্যেক ভাষার পদবিন্যাসগত নির্দিষ্ট রীতি আছে তাকে বলে অন্বয়রীতি বা syntax। এই বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত শ্রেণির সদস্য। যেমন, 'আমি'—সর্বনাম পদ। এই বাক্যে ব্যবহৃত শব্দটির সঙ্গে ওই সর্বমান শ্রেণির অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ, তাকে বলা হয় paradigmatic relationship অর্থাৎ 'আমি'র সঙ্গে আপনি/তুমি/তুই এর যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় paradigmatic relationship আবার 'কাল'-এর সঙ্গে 'আজ' 'পরশু' প্রভৃতি শব্দের paradigmatic relationship রয়েছে। বাক্যের মধ্যে যে শব্দটি রয়েছে তার সঙ্গে ওই সদস্যপদের অন্যান্য শব্দের যে সম্পর্ক তাকেই বলা হয় paradigmatic relationship।

সোস্যুর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ করে ভাষাতত্ত্বচর্চায় অগ্রসর হন। ভাষাবিশ্লেষণে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। (১) ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের নির্দেশ, (২) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে ভাষাবিচার এবং (৩) ভাষাতাত্ত্বিকের তথ্য নির্দেশ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। সোস্যুরকে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ বলা হয়।

সোস্যুরের 'Course in Uniqui Linguistics' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে ভাষাগত আন্দোলনটি গড়ে ওঠে তা প্রাগ-দল (প্রাগ্-স্কুল Prague School) বা প্রাগ চক্র বা প্রাগ সার্কল (Prag Circle) নামে পরিচিত। এই

আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন নিকোলাস এস. ক্রুবেৎস্কয় (১৮৯০-১৯৩৮) প্রাগদলের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। প্রাগদল প্রথমদিকে ধ্বনিতত্ত্বীয় গবেষণায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় ক্রুবৎেসকয়-এর 'Principles of Phonology' (Prague 1939) গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির একটি ফরাসি সংস্করণও প্রকাশিত হয়, তার নাম Princips de Phonologic [Paris, 1949]।

প্রাগস্কুলের সদস্যরা phonology বলতে 'the study of the function of speech-sounds' কেই বুঝিয়েছেন, তাই তাঁদের বলা হয় 'functionalists'। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় তাঁরা ধ্বনি-বৈপরীত্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন। যদি ভাষায় দুটি শব্দের মধ্যে ন্যূনতম পার্থক্য ঘটে দুটিমাত্র ধ্বনির দ্বারা, অর্থাৎ ওই দুটি একই অবস্থানে বসার ফলে শব্দ দুটির মধ্যে অর্থ পার্থক্য ঘটছে তাহলে বলা যায় ওই ধ্বনি দুটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে এবং শব্দদুটি ন্যূনতম শব্দ জোড় (minimal pair) তৈরি করছে। যেমন বাংলার 'তালা' এবং 'থালা' এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে '/ত/' ও '/থ/' বাংলার দুটি ধ্বনি একই অবস্থানে রয়েছে কিন্তু শব্দদুটি অর্থ ভিন্ন। তাই শব্দদুটি ন্যূনতম শব্দজোড় এবং '/ত/' ও '/থ/' বাংলার দুটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প (phoneme) । ভাষায় এই মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্পের (phoneme) সন্ধান ও সংখ্যা নিরূপণের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তার একটা হচ্ছে ন্যূনতম শব্দজোড়ের পরীক্ষা minimal pair test । যেমন বাংলার 'গান' শব্দের /গ/ এর জায়গায় যদি /প/, /দ/, /ধ/ বসানো যায় তাহলে তারা প্রত্যেকেই অর্থবহ হবে এবং তখন বলা যাবে /গ/, /প/, /দ/, /ধ/ বাংলার বিভিন্ন (phoneme) বা মূলধ্বনি। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যে ভাষায় যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি (Phonetically similar) তাদের মধ্যেই বিভ্রান্ত ঘটে বেশি আর সেজন্যই ন্যূনতম জোড় খোঁজা দরকার হয়। অবশ্য আর এক ধরনের পরীক্ষাও করা যায় তা হল প্রতিবেশ অনুসারে পরীক্ষা। প্রতিবেশ দুরকম—(১) ধ্বনি প্রতিবেশ বা phonological context অর্থাৎ একই মূল ধ্বনি দুটি আলাদা প্রতিবেশে সেই প্রতিবেশ অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন, বাংলা 'আলতা' আর 'পাল্টা' এই দুটি শব্দে /ল/ ধ্বনি /ত/ এর সান্নিধ্যে 'দন্ত ল' আর দ্বিতীয় শব্দের /ল/ ধ্বনি /ট/ এর সান্নিধ্যে 'মূধন্য ল' ; তাই এরা দুটি পূরকধ্বনি, বিস্বন allophone বা ধ্বনিকল্প আর /ল/ হল মূলধ্বনি বা phoneme।

(২) অবস্থান প্রতিবেশ বা positional context অর্থাৎ একই ধ্বনির দুটি পূরকধ্বনির একটি যে অবস্থানে থাকে অন্যটি যে অবস্থানে কখনোই যেতে পারে না। যেমন, বংলা /ড/ ধ্বনি শব্দের গোড়ায় বসে, যেমন ডাব, কিন্তু /ড়/ ধ্বনি কখনও শব্দের গোড়ায় বসে না যেমন, মোড়। Phonological oppositions বা ধ্বনিগত বিরোধ কতরকমের হতে পারে সে সম্বন্ধে ক্রুবেৎস্কয় যে ধারণা দিয়েছন তা হল—

১) Bilateral Opposition বা দ্বিপক্ষীয় বিরোধ—যে দুটি ধ্বনির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য (phonetic characterstic) যদি দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় এক হয় তাহলে বলা যায় ওই দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়েছে। যেমন /p ও b/, /t ও d/, /k ও g/ জার্মান ভাষার /k ও x/।

২) Multilateral Opposition বা বহুপক্ষীয় বিরোধ—যে দুটি ধ্বনির মধ্যে বিরোধ রয়েছে তাদের মধ্যে যদি উচ্চারণগত দিক থেকে অমিল অনেক বেশি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে বহুপক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়ে বলা যায়। যেমন, বাংলার /p ও k/, /b ও d/ স্বরধ্বনি /a ও i/-র মধ্যে বহুপক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়েছে বলা যায়।

৩) Proportional Opposition বা আনুপাতিক বিরোধ—এই ধরনের বিরোধ জোড়ায় জোড়ায় ফুটে ওঠে। যেমন বাংলার /p, b/ ও /t, d/ এদের মধ্যে যে বিরোধ তা আনুপাতিক বিরোধ অর্থাৎ এদের মধ্যে অঘোষ বনাম ঘোষ এই বৈশিষ্ট্যে বিরোধ রয়েছে। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এর বিরোধ রয়েছে /k, kh/, /p, ph/-এর মধ্যে।

৪) **Isolated Opposition বা বিচ্ছিন্ন বিরোধ**—যে বিরোধ ভাষার সমস্ত ধ্বনি থেকে একটা জোড়াকে বিচ্ছিন্ন করে আনে সেখানে বিচ্ছিন্ন বিরোধ ঘটেছে বলা হয়। যেমন, স্পেনীয় /r ও ṙ/ ধ্বনির মধ্যে কম্পনজাত ধ্বনির স্থিতি এই ভাষার আর কোনো শব্দজোড়ের মধ্যে দেখা যায় না। তাই এই বিরোধকে বলে বিচ্ছিন্ন বিরোধ।

৫) **Private Opposition বা ঐকিক বিরোধ**—যখন ধ্বনি লক্ষণের উপস্থিত বা অনুপস্থিতির কারণে দুটি সমশ্রেণির ধ্বনির মধ্যে বিরোধ তৈরি হয় তখন ঐকিক বিরোধ ঘটেছে বলা হয়। যেমন /p/ ও /ph/ এর মধ্যে মহাপ্রাণতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি /k/ ও /g/ এর মধ্যে ঘোষবত্তার অনুপস্থিতির ও উপস্থিতি, /b/ ও /m/ এর মধ্যে অনুনাসিকতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি যে ধরনের বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাকে ঐকিক বিরোধ বলা যায়।

৬) **Neutralization বা একরূপণ**—ফোনিমে ফোনিমে যে বিরোধ সেটা কোনও একটা বিশেষ প্রতিবেশে অদৃশ্য হতে পারে। যেমন, ইংরেজি /k/, /b/, /s/ ধ্বনির পরে থাকলে বিরোধ সৃষ্টি করে না। স্পেনীয় ভাষায় /r/, /ṙ/ শুধুমাত্র দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে থাকলে বিরোধ তৈরি করে, অন্যত্র করে না। যেমন /peṙo/ ও /pero/ (perro) বিরোধের এই বৈশিষ্ট্যকে বলে একরূপণ এই শ্রেণির নিরপেক্ষ বা পরিবেশের সাহায্যে নির্দিষ্ট বৈসাদৃশ্যের একটা স্বতন্ত্র নামকরণ করেছেন ক্রুবেৎস্কয়-আর্কিকোনিম (archiphoneme) অর্থাৎ অপ্রচলিত নয় কিন্তু সাধারণভাবেও ব্যবহৃত হয় না এমন মূলধ্বনি।

যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের থাকার ফলে দুটি মূলধ্বনি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে, ক্রুবেৎস্কয় তাকে বলেছেন পারস্পরিক সম্পর্ক। ভাষায় একই পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত একাধিক জোড় থাকতে পারে। যেমন, /p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/, এরা পরস্পরের মধ্যে অনুসরণশীলতার (sonority) সম্পর্কে সম্পর্কিত। আবার একই মূলধ্বনি একাধিক ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি একই সঙ্গে অনুরণশীলতা (sonority) এবং মহাপ্রাণতার (aspiration) সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। বাংলা সৃষ্ট ধ্বনিগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। এর মধ্যে প্রথম পারস্পরিক সম্পর্ক ঘোষতা এবং দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক মহাপ্রাণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে বাংলা মূলধ্বনি দুটো বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশে সক্ষম।

ক খ	ট ঠ	ত থ	প ফ
গ ঘ	ড ঢ	দ ধ	ব ভ

এক্ষেত্রে মূলধ্বনির একই উচ্চারণ স্থান ছাড়াও উচ্চারণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কবেৎস্কয় এই শ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে "পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টি" বা "bundle of correlations" বলে চিহ্নিত করেন।

ইয়েল্‌মস্লেভ—সোস্যুরের ভাষাসমীক্ষার দ্বারা পরবর্তীকালে যিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন, তিনি হলেন লুই ইয়েল্‌মস্লেভ। তিনি ছিলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এবং 'কোপেনহেগেন দলের' পরিচালক। তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বের নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধকরণ দেখা যায় তাঁর Prolegomena to Theory of language (1953) বইতে। এই বইটি মূল থেকে অনুবাদ করেন ইংরেজিতে Francis J. Whitfield। তাঁর তত্ত্ব "গ্লসমেটিক্স" (glossematics) নামে পরিচিত। গ্লসমেটিক্স বিতর্কমূলক হলেও আধুনিক গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের একটা প্রধান অবদান। গ্লসমেটিক্স-এর আভিধানিক অর্থ হল গ্লসিমের বিভাজন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ। গ্লসিম অর্থে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা অর্থগত দিকে পরিস্ফুট করে। ইসেল্‌মস্লেভ ভাষার একটা তত্ত্ব গঠন করার চেষ্টা করেন, যা একই সঙ্গে স্বীকৃতি দেয় যে ভাষা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়াগত বিন্যাস। এই প্রক্রিয়াগত বিন্যাসের প্রকৃতি ও অস্তিত্বের কয়েকটা পন্থা প্রতিপাদন করতে তিনি চেষ্টা করেন।

সেই পন্থাগুলি তিনি অনেকগুলো যুক্তিগত প্রতিপাদন-সম্ভব প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করেন। যখন এই প্রক্রিয়া তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তা মূলপাঠ উৎপাদন করে। মূলপাঠ বিশ্লেষণে গ্লসমেটিক ব্যাখ্যা যুক্তিগত দিক থেকে অভ্রান্ত। ইয়েল্‌মস্লেভ মেটাল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষাশাস্ত্র আলোচনার প্রথম থেকেই তিনি যুক্তিশাস্ত্রীয় ব্যাকরণে উৎসাহ দেখান। যুক্তিশাস্ত্রীয় ব্যাকরণ বলতে তিনি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর ব্যাকরণ যা বীজগণিতের মতন তাই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যাকরণের এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে তিনি গাণিতিক তত্ত্ব ভাষাতত্ত্বে প্রয়োগ করেন।

১.৫.৩ আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ফ্রান্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২), এডওয়ার্ড সাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) ও লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯)।

ফ্রানজ বোয়াস—বোয়াস ছিলেন একাধারে নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বোয়াসের মতে ভাষা উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি এবং বাক্‌অঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ যোগাযোগের মাধ্যমরূপেই ব্যবহৃত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণগত প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। তিনি এরকমও মন্তব্য করেন যে, এক ভাষার রূপ অন্য ভাষার ওপর আরোপ করা সম্ভব নয়। এজন্য কোনো ভাষার ব্যাকরণগত রূপ যেভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। তাঁর মতে ভাষাবর্ণনায় ভাষার রূপমূলের সাহায্যে বিচার করাই একান্ত অভিপ্রেত। অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বিশেষ্যের শ্রেণিকরণে লিঙ্গের দিকটি অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু লিঙ্গের বর্জন বিশেষ্য বিচারে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

এডওয়ার্ড সাপির—মূলত বোয়াসকে অনুসরণ করেই সাপির কোয়াকিয়ুতল, চিনুক, ইয়ানা, নুতকো, উতে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় দিকই লক্ষ করা যায়। সাপির ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ Language is a purely human and non-instictive method of communincating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produceded symbols । ভাষার শ্রেণিবিন্যাসে তিনি সাধিত, যৌগিক, বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষত্মক অনুক্রমের সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি নির্দেশ করেন।

সাপির ও তাঁর ছাত্র বেঞ্জামিন লি. উর্ফ (Benjamin Lee Whorf) মনে করেন যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষার কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। 'সমাজ যেভাবে চিন্তা করে ও আচরণ করে'—সংস্কৃতির সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করে বলা যায় যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির চিন্তার দিক তাদের ভাষা দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তীকালে সাপির-উর্ফের ভাষাসম্পর্কিত ব্যাখ্যা **সাপির-উর্ফ-হাইপোথেসিস** রূপে পরিচিত লাভ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষাগত পার্থক্য আপেক্ষিকতার সাহায্যে একটা নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করে।

লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড—আমেরিকায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়টিকে যাঁরা দৃঢ়মূল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড। তাঁর প্রামাণ্য Text বই 'Language' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ। এটিকে বলা যায় তাঁর আগের লেখা 'Introduction to the study of language' (1914) এর নতুন সংস্করণ। ৩০ এবং ৪০-এর দশকে আমেরিকার ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই 'Language' বই এবং তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশলগুলি দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'Language' ছাত্রদের কাছে Text বই ছাড়াও ছিল আরও অনেক কিছু। তাই আমেরিকার ভাষাতত্ত্বে এই কালকে বলা হয় Bloomfieldian Era। বলা যেতে পারে, 1933 থেকে 1957 এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষাতত্ত্ব নিজের স্থান বেশ কায়েমি করে নিয়েছিল এবং যাঁর প্রভাবে ও দাক্ষিণ্যে এই বিষয়টি বিদ্বৎসমাজে একটা সুদৃঢ় আসন লাভ করেছিল তিনি হলেন ব্লুমফিল্ড। তৎকালীন ভাষাতত্ত্বকে তাই বলা হয় 'Bloomfiedl Linguistics' এই সময় ভাষাতত্ত্ব-

অনুশীলনে যা করা হয়েছিল সেটা হল ভাষার সাংগঠনিক বিশ্লেষণ (formal analysis) এর ওপর নজর দেওয়া হল বেশি। এই ধরনের বিশ্লেষণে দুটি মৌলিক এককের ধারণা কার্যকর হল—সে দুটি ধারণা স্বনিম (pheneme) এবং রূপিম (morpheme) সম্পর্কে ধারণা। ব্লুমফিল্ড শব্দের প্রথাগত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাকে ব্যাকরণগত একক বা grammatical unit বলেছেন, যদিও তাঁর পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যাকরণগত বর্ণনার ওপর ততটা জোর দেননি। বাক্যের গঠন কীরকম হবে তা নির্ধারণ করার জন্য অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ বা immediate constituent analysis-এর সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার সংগঠন-র নিয়ম অনুসারে রূপিমগুলি পরপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। বাক্যের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্যাকরণগত দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত তার আলোচনার ওপর অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংগঠন অন্বয়ের দিক থেকে স্থূলভাবে অব্যবহিত উপাদানের যে-কোনো একটির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হয় কিনা তার উপর ভিত্তি করে ব্লুমফিল্ড endocentric এবং excentric এই দুরকম মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে phoneme sequence-ই হোক আর morpheme-group-ই হোক phoneme এর morpheme-এর ধারণা প্রকাশ করা হয় distributional relations বা পরিবেশগত বর্ণনার দ্বারা। তাই এসময়ের কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানীকে distributionalists-ও বলা হয়।

১৯১৭-য় ব্লুমফিল্ডর Tagalog Texts with Grammatical Analysis প্রকাশিত হয়। যদিও শিক্ষক হিসাবে তিনি জার্মানিক ভাষাতত্ত্ব পড়িয়েছেন কিন্তু তাগালোগ (Tagalog) এবং মেনোমিনি (Menomini) ভাষার ওপর তাঁর গবেষণা তাঁকে structural analysis (গঠনমূলক বিশ্লেষণ) বিশেষ করে phonemic analysis-এ অনুপ্রাণিত করে এবং পথ দেখায়। Regularity of phonemic change বা ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুবর্তিতাই যে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা—একথা বলেছেন ব্লুমফিল্ড। সোস্যুর যে structuralism-এর সূচনা করেন তার পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন তিনিই। ভাষার বাহ্য-আবরণ অর্থাৎ তার দেহের ধ্বনি-শব্দ-বাক্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন অর্থাৎ ভাষাকে তিনি একটি যান্ত্রিক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাষার sound-pattern সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মমতোই পরিবর্তিত হয়, শুধুমাত্র সেই pattern টিকে সুনির্দিষ্ট পথে খুঁজে বের করতে হয়। ধ্বনিপরিবর্তনের এই সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতিই ভাষাবিজ্ঞানের মূল কাঠামো।

শব্দার্থ ভাষার আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, সোস্যুর বলেছেন ভাষা হচ্ছে মনের ধারণা (concept) ও তার প্রকাশের (expression) একটা যোগসূত্র। অর্থাৎ Language is a system of signs, a joining of the signifier and the signified of from and meaning এখানে বোঝানো হচ্ছে শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট, সেকারণেই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয়। প্রাগ স্কুলের সদস্যরাও বলেন, দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকে বলেই একই পরিবেশে থেকে দুটি ধ্বনি কোনো ভাষায় দুটি স্বনিম (phoneme) হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্লুমফিল্ড ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সহমত হতে পারেন নি। তিনি মনে করেন কোনো ভাষা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি অ-ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে হতে পারে না। এ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ডের মতামতকে আমরা তুলে ধরতে পারি Meaning must be investigated through formal (structural) differences in a language, since it is just these formal differences that determine differeinces in meaning, ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষায় ধ্বনি উচ্চারিত হয় একটা প্রতীক হিসেবে। আর সেই উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের অর্থ বলতে বোঝায় সেই অবস্থাকে (situation) যে অবস্থায় বক্তা সেটা উচ্চারণ করে আর শ্রোতার কাছে ঠিক তার প্রতিক্রিয়াটি পৌঁছায়। এই অবস্থা বলতে বোঝায় বক্তার নিজস্ব বিশ্বের প্রতিটি বস্তু এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া যা তাঁকে—ওই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে প্ররোচিত করে। আমেরিকায় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্লুমফিল্ডের অবদান যে কতখানি তা 'ল্যাঙ্গুয়েজ' সম্পাদক বানার্ড ব্লখের নিম্ন-উদ্ধৃত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়—

It is not too much to say that every significant refinement of analytic method produced in this country since 1933 has come as a direct result of the impetus given to linguistic research by Bloomfield's book. If today our methods are in some ways better than his, if we see more elearly than he did himself curtain aspects of structure that he first revealed to us, it is because we stand upon his shoulders. [Language, 25:92].

ব্লুমফিল্ডের 'ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে তিনি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন আলোচনা করেন নি। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে এগিয়ে আসেন কেনেথ এল. পাইক ও ইউজিন এ. নিডা (Eugene A. Nida)। পাইক বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুখণ্ড ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics : 1942) ও মূলধ্বনিতত্ত্ব (Phonemics : 1943) বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি উচ্চারণীয় পরিভাষার যথাযথ বর্ণনার সাহায্যে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন, যা ইউরোপীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকদের নজরে আসেনি। পাইকে উৎসাহ ছিল আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ধ্বনি বিশ্লেষণে। আমেরিকার গঠনবিদদের কাছে তখন আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ধ্বনির উচ্চারণে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে তিনি মনে করেন। ধাপে ধাপে বর্ণনার মাধ্যমে তিনি মূলধ্বনির বিশ্লেষণ করেন এবং এই কাজে তিনি বিভিন্ন আদিম ভাষার উদাহরণ ব্যবহার করেন। তাই তাঁর প্রদত্ত উদাহরণ থেকে আমেরিকার বিভিন্ন আদিম ভাষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কত গভীর তা বোঝা যায়। তাঁর দুটি বই Summer Institute of Linguistics-এ প্রশিক্ষণ গ্রন্থরূপে বহুল ব্যবহৃত।

নিডার (E. A. Nida)-র রূপমূলতত্ত্ব বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগেই রচিত এবং এই বইটিও ভাষাপ্রশিক্ষণের কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। তাঁর Morphology : The Deseriptive Analysis of Words প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। ১৯৪৯-এ বইটির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আবার প্রকাশিত হয়। সেসময় গ্রন্থকার মেক্সিকোর ভারতীয় ভাষা থেকে প্রচুর উদাহরণ কাজে লাগিয়ে বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

১.৫.৪ নোয়াম চম্‌স্কি

আধুনিক বর্ণনামূলক এবং গঠনসর্বস্বতাবাদী ভাষাবিজ্ঞানের (descriptive and structural linguistics) ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা করেন আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স ইন্সটিটিউট অব্ টেকনোলজির (Masschusetts Institute of Technology) অধ্যাপক নোয়াম্ চমস্কি (Noam Chomsky) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Syntactic Sructures' প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের জগতে ভাষা সম্পর্কে এক নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। চম্‌স্কি জন্মসূত্রে ছিলেন ইহুদি। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয় প্রধানত আমেরিকায়। পেন্‌সিল্‌ভেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি সেখানে পড়েছিলেন অঙ্ক ও দর্শনশাস্ত্র। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনায় তাই অঙ্কশাস্ত্রের যথাযথতা ও দর্শনশাস্ত্রের গভীরতার ছাপ পড়েছে।

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে চম্‌স্কি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন Syntactic structures (1957), Current Issues is Linguistic Theory (1964), Aspects of the theory of Syntax (1965), Topics in the theory of Generative Grammar (1966), Cartesian Linguistics : A Chapter in the History of Rationalist Thought (1966) Language and Mind (1968); Studies on Semanties in generative grammar (1972), On Wh-movement (1977), Lectures of Government and binding (1981), Knowledge of language : Its natures, origins and use (1986).

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Aspects of the Theory ' প্রকাশিত হলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক তত্ত্ব 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব' (Transformational Generative Grammar) প্রতিষ্ঠা

লাভ করে। কেউ কেউ একে 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের' তত্ত্বও বলেছেন। এই তত্ত্ব এতটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক ভাষাগুলির বিশ্লেষণে ও ব্যাকরণরচনায় এই তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এমনকি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে ও ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই নতুন তত্ত্বকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আবার শুধু ভাষাবিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যে কারণে এই তত্ত্ব এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা হল তার রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্বের। মূল কথাই হল, ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ সৃজনশীলতা রয়েছে, তাই ভাষার সঙ্গে মানুষের সৃজনী চেতনার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে চমস্কি বলেছেন ঃ "... ... One of the qualities that all languages have in common is their creative 'aspects'... ... The grammer of a particular language, then, is to be supplemented by a universal grammar that accommodates the creative aspect of language use"—Aspects of the Theory of Syntax, P. 6।

আসলে চম্‌স্কি ভাষার সৃজনশীলতার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন, তাই ভাষার দেহগত নয়, মনোগত দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দিলেন তিনি। এইজন্য তাঁর তত্ত্বকে মনস্তত্ত্বপ্রধান তত্ত্ব (mentalistic theory) বলা হয়। একজন মানুষ যখন তার মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা উপলক্ষে তাকে বহুপ্রকারের অসংখ্য বাক্য ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় প্রয়োজনে তাকে নতুন বাক্য তৈরি করে নিয়ে বলতে হয়। এই ব্যবহৃত সব বাক্যই নিশ্চয়ই সে আগে থেকে শিখে রাখে না, তা সম্ভবও নয়। ভাষাপ্রক্রিয়া সেরকম কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। আসলে একজন ভাষী (speaker) তার মাতৃভাষার মূল নিয়মগুলো নিজের সহজ বোধ ও বোধির সাহায্যে আয়ত্ত করে থাকে। তারপর সেই মূলনীতিটুকু প্রয়োগ করে ভাষার সীমাবদ্ধ উপকরণকে নিজের সৃজনীক্ষমতা দিয়ে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন বাক্য সৃজন (generate) করে চলে। এই বাক্যসৃজনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলেই চমস্কির ব্যাকরণকে সৃজনমূলক ব্যাকরণ বা generative grammar বলে। মাতৃভাষার ব্যাকরণের মূলনিয়মগুলো মানুষ তার সহজবোধের সাহায্যে আপনা থেকেই শিখে নেয়। তারপর ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে উপাদান আহরণ করে তাতে ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে সেই শব্দগুলিকে সাজিয়ে নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি করে চলে। ভাষীর এই যে সৃজনীক্ষমতা এর দুটো দিক আছে। একটা বাস্তব ব্যবহারের দিক যাকে চম্‌স্কি বলেছেন performance আর ভাষার পরিপূর্ণতার যেটুকু অংশ আদর্শ বা ideal রূপে থেকে যায় তাকে বলে সম্ভাবনা (competence)। একজন ভাষাতত্ত্ববিদ ভাষার বাস্তবরূপ (performance) বিচার ও বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু ভাষার আদর্শ সম্ভাবনা বা সম্পর্কে কোনো Perspective grammar তিনি রচনা করতে পারেন না। ভাষা যেমন সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ব্যাকরণও হল তেমনি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, কিন্তু তা কোনো যান্ত্রিক বিধান নয়।

গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের মতো চম্‌স্কি ভাষাকে শুধু বহিরঙ্গের গঠন বলে গ্রহণ করেন নি। এই বহিরঙ্গ গঠনের অন্তরে যে গভীর দিক রয়েছে তাকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার দুটি দিক তিনি স্বীকার করেছেন—বহিরঙ্গ গঠন বা surface structure এবং অন্তরঙ্গ গঠন বা deep structure। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনটি আমাদের ধ্বনিপ্রবাহ sound structure দিয়ে গঠিত আর অন্তরঙ্গ দিকের সঙ্গে রয়েছে অর্থের যোগ। চম্‌স্কির ব্যাকরণে এই বহিরঙ্গ গঠন ও অন্তরঙ্গ গঠন, এই ধ্বনি ও অর্থের যোগটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, তাতে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি পরিষ্কার হয় এবং বাক্যের অস্পষ্টতা (ambiguity) ধরা পড়ে। যেমন, 'তিস্তা প্রথম মাখন দিয়ে ভাত খেল।' এই বাক্যের একাধিক অর্থ হতে পারে—(১) তিস্তা এই প্রথম মাখন দিয়ে ভাত খেল, আগে কখনও খায়নি। আর (২) তিস্তা অন্য কিছু দিয়ে খাওয়ার আগে সবার প্রথমে মাখন দিয়ে ভাত খেল। বাক্যটির এই একাধিক অর্থ হওয়ার কারণ হল—'প্রথম' শব্দটির সঙ্গে বাক্যের কোন্ শব্দের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক তা স্পষ্ট নয়। যদি 'মাখন'-এর সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে নিকট হয় তাহলে প্রথম

অর্থটি পাওয়া যাবে। আর যদি 'খেল'-এর সঙ্গে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হয় তাহলে দ্বিতীয় অর্থটি পাওয়া যাবে। 'প্রথম' শব্দটির পদ-পরিচয় ঠিকমতন ধরা যাচ্ছে না বলে প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যের অন্য কোন্ শব্দের সঙ্গে 'প্রথম' শব্দটির সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক আছে তা স্পষ্ট হচ্ছে না। তাহলে বলা যায়, একটি বাক্যে শব্দগুলির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য আছে। এই তারতম্য নির্দেশ করার জন্য চম্স্কি একটি বাক্যের পদগুলিকে যে পরম্পর্যের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন তাকে একটা বৃক্ষানুরূপ চিত্রের (tree-diagram) সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারি। এখানে বাক্যকে প্রথমে দুটি বৃহত্তম এককে ভাগ করা হয়েছে—NP অর্থাৎ Noun Phrase এবং VP অর্থাৎ Verb Phrase। এবার Noun Phrase ও Verb Phrase-এর অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তারতম্য বৃক্ষানুরূপ চিত্রের সাহায্যে এভাবে নির্ণয় করতে পারি। একটি সরল বাক্য নেওয়া যাক ঃ আমি লাল গোলাপ ভালোবাসি।

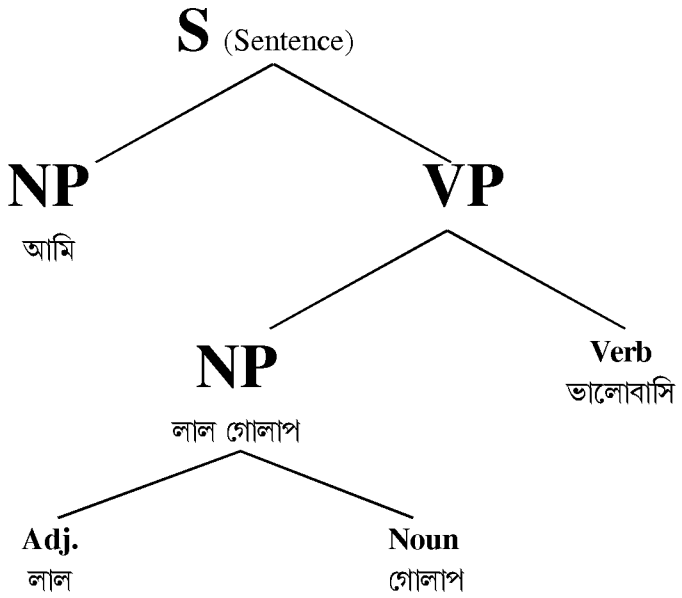

এই চিত্রের সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্য শব্দের সম্পর্ক কত দূরর বা কত কাছের। যেমন 'লাল'-এর সঙ্গে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক 'গোলাপ'-এর। 'আমি'-র সঙ্গে 'লাল'-এর সম্পর্ক অনেক দূরের। এই হল চম্স্কির বাক্য-বিশ্লেষণ-রীতির সহজ পরিচয়।

চম্স্কির ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল, ভাষাগত বিশ্বজননীর (Linguistic Universals) তত্ত্ব। একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব গঠন বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক ভাষার স্বনিমসংখ্যা ভিন্ন, স্বনিমের ক্রিয়াপদ্ধতি আলাদা, এমনকি শব্দরূপ-ধাতুরূপের বিধান এবং বাক্যগঠনের রীতিও পৃথক। তবুও সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্য কিছু মূলীভূত ঐক্য আছে। জাতিতে জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক, মানুষ মূলত এক। তার দেহযন্ত্র বাগ্যন্ত্র থেকে তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এই কারণেই সব জাতির ভাষাপ্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূলগত ঐক্য আছে। এই মানবিক ঐক্যের ওপর ভিত্তি করেই বিশ্বজনীনতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানে যে মূল ঐক্য তাকে বলা হয় substantive universals। বাইরের রূপে একটা ভাষার বাক্যগঠন অন্য ভাষার বাক্যগঠনের চেয়ে কিছু আলাদা হতে পারে। কিন্তু দুই ভাষার বাক্যগঠনের গভীর স্তর (deep structure) পর্যালোচনা করলেই একটা অন্তর্লীন ঐক্য ধরা পড়বে। যেমন, ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষার দুটি বাক্য বিশ্লেষণ করা যাক—

বাংলা - আমি লাল গোলাপ ভালবাসি।

ইংরাজি - I like red roses

বাক্য দুটির গঠন বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে —

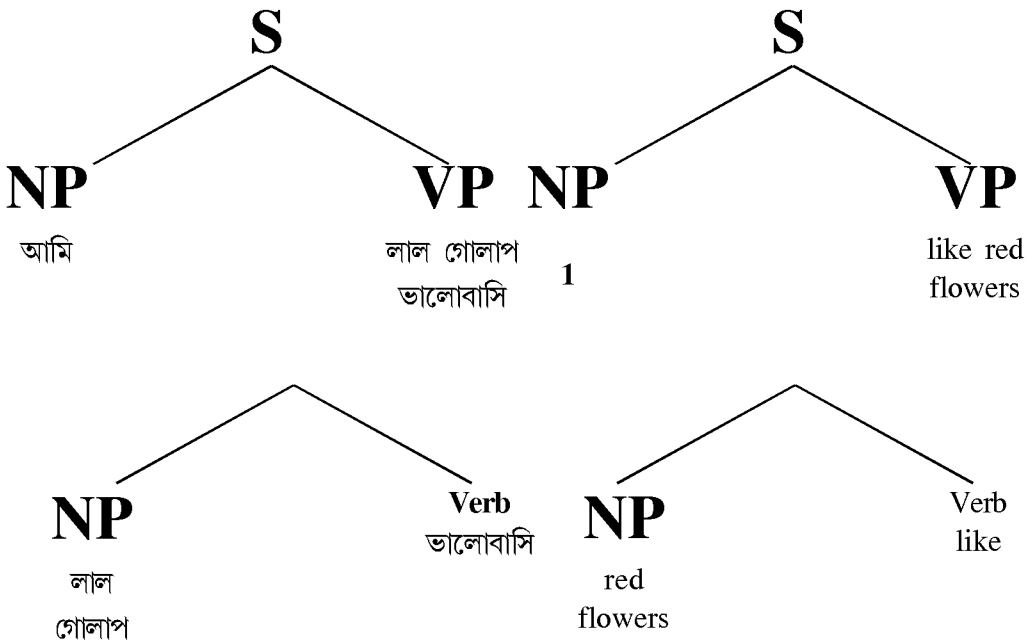

এখানে দেখা যাচ্ছে—বাংলায় object, Verb-এর আগে বসেছে আর ইংরাজিতে Object, Verb-এর পরে বসেছে। কাজেই দুই ভাষার মধ্যে বাক্যের গঠনে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুই ভাষাতেই NP, VP আছে এবং দুইভাষার বাক্যেই Verb ও Object আছে। এই NP, VP এই Verb, Object ইত্যাদির ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সব ভাষাতেই থাকে। এই ধারণাগুলিই হল Linguistic Universals। অনেক ভাষাতে হয়তো বাহ্যগঠনে NP, VP ইত্যাদি ধরা পড়ে না। কিন্তু আন্তর গঠনে এগুলি থাকেই। যেমন, 'চলে এসো'। এই বাক্যে শুধু VP আছে কিন্তু NP 'তুমি' এখানে উহ্য আছে। কাজেই একথা বলা যায়, Linguistic Universals গুলি সমসময় ধরা পড়ে না। কিন্তু ভাষার অন্তর গঠনে তাদের অস্তিত্ব থাকেই।

১.৬ অনুশীলনী

১। প্রাচীন যুগে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে পরিচয় যায় সে সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখুন।

২। প্রাচীন যুগে গ্রিস ও রোমে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা কীভাবে হয়েছিল তার পরিচয় দিন।

৩। মধ্যযুগে এবং প্রাক্-আধুনিক পর্বে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের সেই চর্চার সাধারণ পরিচয় দিন।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ পাণিনি, লিব্‌নিৎস, হার্ডার, উইলিয়াম জোন্স।

৫। গ্রিমের সূত্র কী ? উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। জার্মানিতে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে রাস্ক, বপ ও হুমবোল্টের অবদান সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ আর. কে. রাস্ক ; ফ্রানৎস বপ ; হুমবোল্ট ; কার্ল ভের্নের।

৮। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অগাস্ট শ্লেইশার এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯। নব্য বৈয়াকরণ বলতে কী বোঝায় ? তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০। গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় ? এই ধারার প্রবর্তন করেন কে ? তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ পাসল (pasole) ও লাঁগ (langue) ; সমকালীন ও অতীতকালীন ভাষাসমীক্ষা (Synchronic ও diachronic study); Syntagmatc ও Paradigmatic relationship।

১২। ধ্বনিগত বিরোধ সম্পর্কে ব্রুবেৎস্কয়ের আলোচনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন।

১৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ ইয়েল্‌মস্লেভ, ফ্রান্‌জ বোয়ার্স, এডওয়ার্ড সাপির।

১৪। আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৫। নোয়াম চমস্কির 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের' (Transformation Generative Grammar) তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ—আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।

৩। R. H. Robins—A short History of Linguistics.

৪। John. T. Waterman—Perspectives in Linguistics.

৫। David Crystal—Linguistics.

৬। Emmon Bach—An Introduction to Transformation Grammar, 1964.

৭। C. L. Baker—Introduction to Generative Transformational Syntax. 1978.